বাংলাদেশ সরকার একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি

গত ৫২ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। গত বছর, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন এবং সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন উভয়ই দুই দেশের মধ্যকার এ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে জোর দিয়েছেন। বাংলাদেশের সাথে সব সময়ই সুসম্পর্ক রাখতে তারা আগ্রহী। মূলত, মার্কিন প্রশাসন একের পর এক তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে আমাদের সম্পর্ক জোরদার করার উপায় খুঁজতেই। বর্তমানে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তন, রোহিঙ্গা সমস্যা, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শ্রম সমস্যা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনসহ জনগণের উন্নয়নের মতো বহুমুখী ইস্যুতে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বমূলকভাবে একসঙ্গে কাজ করছে। এছাড়াও, এদেশের গণতান্ত্রিক ধারা ঠিক রাখা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা এবং সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদির উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ সব সময়ই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। যার সারকথা হলো, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইনের চোখে সবাই সমান। 'আইনের শাসন' ও সুশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য কুখ্যাত "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বাতিল করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী পলাতক খুনি জনাব রাশেদ চৌধুরীকে হস্তান্তর করার জন্য মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। যেহেতু আমেরিকা আইনের শাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা আশা করি তারা শিগগিরই তাকে বাংলাদেশে ফেরত দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু মার্কিন আইন প্রণেতা এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, কয়েকটি চীনা কোম্পানি বাংলাদেশে কয়েকটি মেগা প্রকল্প নির্মাণে নিয়োজিত থাকায় বাংলাদেশ চীনা ঋণের ফাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি মোটেও সেরকম নয়। মূল ব্যাপার হলো, যেহেতু চীনা কোম্পানিগুলো আন্তর্জাতিক পাবলিক টেন্ডার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম দর প্রস্তাব করেছিল, তাই তারা কাজ পেয়েছে। যেমন পদ্মা সেতুতে রেললাইন নির্মাণের কাজ পেয়েছে তারা। বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থে এটি নির্মাণ করছে। চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেলের কাজটি করতেও একটি চীনা কোম্পানিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। শুধু যে চীনা কোম্পানিই কাজ করছে তা কিন্তু না। আমাদের সাথে কাজ করছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কেউ জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বা ভারত সম্পর্কে উল্লেখ করে না, অথচ এরাও চীনা কোম্পানিগুলোর মতো বাংলাদেশে প্রকল্প নির্মাণের সাথে জড়িত।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল নির্মাণ করছে জাপান এবং ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের পাশাপাশি কয়েকটি মহাসড়ক ও বাইওয়ে নির্মাণ করছে তারা। এখন পর্যন্ত, একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঋণ নিয়েছে জাপান এবং জাইকা থেকে। অন্য কোনো দেশ তাদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না। বাংলাদেশ ঋণ গ্রহণে সব সময়ই অত্যন্ত বিচক্ষণ। বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ জিডিপির প্রায় ১৩.৭৮%। অথচ আইএমএফ-এর হিসেব অনুসারে, যদি কোনও দেশের বৈদেশিক ঋণ জিডিপির ৫৫%-এর বেশি হয়, তাহলেই কেবল ওই দেশের ঋণ-ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এবং আইএমএফ ইত্যাদির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ ৬১% ঋণ নিয়েছে। একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে জাপান থেকে, যার পরিমাণ ১৭%। অথচ চীন থেকে প্রাপ্ত মোট ঋণ প্রায় ৪.০ বিলিয়ন ডলার মাত্র, যা এদেশের জিডিপির ১% এরও কম। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি এবং যা প্রায় ২১%। তারপরে আছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং মালয়েশিয়া। সম্প্রতি আরও অনেক দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং এর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, কাতার, অস্ট্রেলিয়া এবং চীন অন্যতম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কয়েকটি দেশ চীনের উত্থান ও বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। এখানে আমাদের সতর্কতার সাথে অগ্রসর হওয়ার বিকল্প নেই। যেহেতু বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে চীন ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত একটি দেশ এবং আমরা সব সময় অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলি, সুতরাং কোনো পক্ষেই আমাদের সমর্থন বা বৈরীতা নেই। কারণ আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল নীতিই হল "সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরীতা নয়"। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এ পররাষ্ট্রনীতি। আমরা এখনো সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছি। সব পক্ষের, সব দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে বদ্ধপরিকর বাংলাদেশ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক ঘোষণা করেছে, যেখানে সবার জন্য একটি উন্মুক্ত, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিয়ম-ভিত্তিক নেভিগেশনের প্রস্তাব করেছে। ভারত ও জাপান উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম। বাংলাদেশ সব সময়ই পুরোপুরিভাবে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এদেশে শত শত মিডিয়া রয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম খুবই সক্রিয় ও স্বাধীন। যদিও বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় প্রায় অর্ধেক, তবুও বাংলাদেশে প্রায় তাদের সমান সংখ্যক দৈনিক পত্রিকা রয়েছে। রয়েছে সরকারি- বেসরকারি টেলিভিশন। এদেশের মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া অত্যন্ত সক্রিয়। এখানে কোনো কিছু তাদের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার সুযোগ নেই। মুক্ত ও স্বাধীনভাবে তারা সব সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের

সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ (প্রতি বর্গ মাইলে ৩,৩০০ জন) এবং একটি স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশ। তবুও এদেশের জনশক্তি অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় অনেক ভালোভাবে ও স্বস্তিদায়ক জীবন যাপনের সুযোগ পায়।

জাতিসংঘের একজন বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার যখন রিপোর্ট করেছিলেন যে, 'বাংলাদেশের কয়েকটি এনজিও দাবি করেছে যে, বাংলাদেশে ৭৬ জন নাগরিক অপহৃত বা নিখোঁজ হয়েছেন, সরকার সাথে সাথে এটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এসব ঘটনার অনেকগুলোরই কোনো সত্যতা নেই। এই ৭৬ জনের মধ্যে ৮ জন তাদের পরিবারের সাথে তাদের নিজ বাড়িতে বসবাস করছেন। দুজন ভারতীয় নাগরিক ভারতে তাদের নিজ বাড়িতে বসবাস করছেন এবং ২৮ জন বিচার থেকে পলাতক রয়েছেন। বাকি যে ৩৮ জন, তাদের পক্ষ হতে পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগই আসেনি। সুশীল সমাজ বা মানবাধিকার সংস্থা কেউই বাকিদের সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেননি। কিন্তু সবাইকে অপহৃত বা নিখোঁজ বলে প্রচার করা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে বলা হলেও তা তারা দিতে পারেনি। উল্টো তারা দাবি করছে সরকার তাদেরকে হয়রানি করছে! সুতরাং, পুলিশ অনেকটা বাধ্য হয়েই তাদের বাড়িতে আর না গিয়ে তাদের নিখোঁজ হওয়ার সময়, স্থান, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য জমা দেওয়ার অনুরোধসহ চিঠি পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, এসব নিখোঁজের ঘটনার অনেকগুলোই পারিবারিক। পারিবারিক কলহের কারণে অনেকেই তাদের বাড়িঘর বা পরিবার ছেড়ে চলে যেতে পারে বিভিন্ন জায়গায়। কিছু আর্থিক চাপ এবং কাজের চাপ, বেকারত্ব ইত্যাদির কারণেও গা ঢাকা দেয় অনেকে। বাংলাদেশ সরকার কখনোই কোনো নাগরিককে বিচারবহির্ভূতভাবে নিখোঁজ বা হত্যা দেখতে চায় না। বিনা বিচারে হত্যার মতো জঘন্য ঘটনা এদেশে ঘটে না সেভাবে, যা ঘটে খোদ আমেরিকায়। প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক হাজার মানুষ নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই বিনাবিচারে নিহত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউ স্কুল, শপিংমল, ক্লাব, পার্ক বা খোলা জায়গায় বন্দুক সহিংসতা দেখতে চায় না, তবুও এটি ঘটে। একইভাবে, বাংলাদেশেও কেউ কোনো নাগরিককে অপহরণ হতে দেখতে চায় না, তবুও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা ঘটে যায় দু একটা ক্ষেত্রে। কিন্তু যখনই এমন কোনো ঘটনা ঘটে, সরকার তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কোনো স্থান নেই।

শেখ হাসিনার সরকার গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে যখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তখন বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে জীবন মরণ লড়াই করেছিল এবং ৩০ লক্ষ মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছিল। এদেশে গণতন্ত্র এমনি এমনি আসেনি। অনেক ত্যাগ, অনেক রক্ত, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে এজন্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের ভোটের অধিকার, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ বছর ধরে বারবার কারাবরণ করেছেন। তিনি দুর্নীতি, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বিরামহীনভাবে। তার হাত ধরেই এদেশের মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পেয়েছে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেখ হাসিনাও ভোটের অধিকার, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র সরকারপ্রধান যিনি গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এত কষ্ট করেছেন। তিনি তার পুরো পরিবার, বাবা, মা, দশ বছরের ছোট ভাইসহ তাঁর ৩ ভাই, সবাইকে হারিয়েছেন; ১৯৭৫ সালে তাঁর পরিবারের মোট ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তবুও তিনি হার মানেননি। মাথা নত করেননি অন্যায়ের কাছে।

বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে শেখ হাসিনা বহু জেল-জরিমানা, হয়রানি ও বঞ্চনা সহ্য করেছেন। গণতন্ত্র তাঁর রক্তে মিশে আছে। তাঁর দল, বাংলাদেশের বৃহত্তম দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিরায় রয়েছে গণতন্ত্রের উপাদান। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বদা জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসে। বাংলাদেশের অন্য কয়েকটি দলের মতো কখনোই পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় বসে না আওয়ামী লীগ। জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা সব সময়ই "অবাধ ও সুষ্ঠু" নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য তিনিই প্রথম বারের মতো এদেশে বায়োমেট্রিক ফটো ভোটার আইডি ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স স্থাপন করেছেন, যাতে কেউ জাল ভোট দিতে না পারে। তিনি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের নির্বাচন কমিশন বর্তমানে অনেক শক্তিশালী। কোনো প্রকারের পক্ষপাত বা ভয়-ভীতি ছাড়াই স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার সব সক্ষমতা ও জনবল রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। বেসামরিক এবং নিরাপত্তা উভয় ক্ষেত্রেই যে কোনো কর্মকর্তাকে স্থগিত, বদলি বা বরখাস্ত করার ক্ষমতা তাদের আছে। তারা কোনো হস্তক্ষেপ বা পক্ষপাতিত্ব খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে দোষী কর্মকর্তা-র্কমচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। তার চেয়েও বড় কথা, যদি তারা নিশ্চিত হয় যে কোনো কেন্দ্রে জালিয়াতি বা পেশিশক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভোট কারচুপি হয়েছে, তাৎক্ষণাৎ সেই কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতাও তাদের আছে।

গত ১৫ বছরে, আওয়ামী লীগ সরকার বহু নির্বাচন পরিচালনা করেছে এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছাড়া, সাধারণভাবে, সকল নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। অতি সম্প্রতি, পাঁচটি সিটিতেও মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং এমনকি অহিংস ছিল। চমৎকার কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। যাইহোক, এটি একটি বাস্তবতা যে, নির্বাচন কমিশন বা বাংলাদেশ সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অহিংস নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, সমস্ত রাজনৈতিক দলের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া, কেউ বাংলাদেশে অহিংস নির্বাচনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, পারবেও না। যদি বিএনপি বা জামায়াতের মতো বিরোধী

দল নির্বাচন বর্জন করে বা নির্বাচনী কেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেয়, ব্যালট বাক্স ভাংচুর করে, ভোটারদের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সরকারি-বেসরকারি বাস, ট্রেন, নৌকা, যানবাহন জ্বালিয়ে দেয়, যেমনটা তারা ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে করেছিল, তাহলে একটি অহিংস নির্বাচন কিছুতেই আশা করা যায় না। এ কারণেই একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অহিংস নির্বাচনের জন্য সকল দলের অংশগ্রহণ ও আন্তরিকতার সাথে অঙ্গীকার করা অপরিহার্য।

#

লেখক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পিআইডি ফিচার